বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৬ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৫

আচারে ভিন্ন, সংখ্যায় নগণ্য বাউল-ফকির ও রাষ্ট্র

গোলাম নবী মজুমদার*

১। ভূমিকা

রাষ্ট্রীয় এবং অরাষ্ট্রীয় নানাবিধ হস্তক্ষেপ সমসাময়িক বাংলাদেশের ভিন্নমার্গী বাউলদের, বিশেষ করে ফকিরদের, কিভাবে প্রভাবিত করেছে, বর্তমান নিবন্ধে সে বিষয়টি পরীক্ষা করা হয়েছে। আমি ফকির লালন শাহের (১৭৭৪-১৮৯০) অনুসারীদের নিয়ে একটি এথনোগ্রাফিক গবেষণা করেছি বিভিন্ন সময়ে আখড়ায় অবস্থান করে। এ গবেষণায় দেখা গেছে, সহযোগিতার স্পষ্ট মনোভাব থাকা সত্ত্বেও ফকিরদের ভিন্নমতাবলম্বী জীবনযাত্রা ধীরে ধীরে কোঅপটেড বা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। সরকারি কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় গণমাধ্যম ও প্রভাবশালী সিভিল সমাজের সদস্যরা এ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ নিবন্ধে আরও আলোচনা করা হয়েছে কেন লালন গীতির জনপ্রিয়তার পাশাপাশি আখড়াকেন্দ্রিক গুরুবাদী চর্চার প্রতি আগ্রহে ভাটা পড়ছে।

কথিত আছে যে, ফকির লালন শাহকে জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত অবস্থায় কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ার কালিগঙ্গা নদীর তীর থেকে উদ্ধার করা হয় (চৌধুরী ২০০৯ ক: ১১-১৪)। পরবর্তীকালে তিনি কেবল বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে প্রভাবশালী চারণ কবি হয়ে উঠেন তাই নয়, সমসাময়িক বাংলাদেশের জনপ্রিয় আত্মিক ঐতিহ্যের (স্পিরিচুয়াল হেরিটেজের) কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও তিনি কমপক্ষে পাঁচশত গান রচনা করেন, যেগুলির কথা সরল কিন্তু চিন্তায় গভীর (চৌধুরী ২০০৯খ, দাস ১৯৫৮, রফিউদ্দিন ২০০৯)। লালন দশ হাজারেরও বেশি অনুসারী রেখে গেছেন (হিতকরি ১৮৯০)। লালনের মতো তাঁর অনুসারীরাও ফকির বলে পরিচিত। এদের অধিকাংশই দরিদ্র এবং গ্রামের অধিবাসী এবং তারা একতারা নিয়ে গান করেন, সাধন-ভজনের রীতিনীতি পালন করেন এবং ইহজগতে দৈবের বাণী প্রচার করেন। তাঁরা মনে করেন শ্রেণী, বর্ণ, জেণ্ডার, নৃতত্ত্ব কিংবা ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষই সৃষ্টিকর্তার অনন্য প্রকাশ।

দেহের মধ্যে অনুমেয়রূপে বিরাজমান রয়েছে যে সহজাত দৈব এই দৈবের উপলব্ধি করতে গুরুমুখী সাধনা প্রয়োজন, এক্ষেত্রে অহং বিষয়ে গুরুর নির্দেশিত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন (চক্রবর্তী ১৯৯২, ঝা ২০০৮, Openshaw 2002, শরীফ ২০০৯)। ফকিররা সংখ্যায় কম। তাদের উপর এখনও কোনো জরিপ হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাদের প্রভাব অপরিসীম। লালন ধামে প্রতিবছর যে দোল উৎসব ও তিরোধান দিবস পালন করা হয় সেখানে শহুরে শিক্ষিত লোকসহ হাজার হাজার লোক যোগ দেন। পর্ব দুটিতে, অন্তত:পক্ষে দুইদিন ধরে, অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের নিজস্ব আচার, রীতিনীতি পালন করেন এবং গান বাজনা করেন। অনুষ্ঠান দুটির খবর জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেল, রেডিও স্টেশনে প্রচারের পাশাপাশি সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়।

* গবেষক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

ফকিররা তাঁদের ভিন্নমতাবলম্বী জীবনধারার জন্য বিখ্যাত। তাঁরা উচ্চ-নীচ জেণ্ডার স্তরবিন্যাসের ধারণা পাল্টে দেন (Knight 2011, McDaniel 1992), জাতিবর্ণের শুদ্ধতা ও স্তরবিন্যাসকে উপেক্ষা করেন, সৃষ্টিকর্তার অনন্ত রূপ হিসেবে "সহজ মানুষ" ও গোটা মানব সম্প্রদায়কে ডিভাইন মনে করেন ((চক্রবর্তী ১৯৮৯, Jha 1995, ঝা 2010, Openshaw 2002)। ফকিরদের ভিন্নমার্গীয় অনুশীলনকে ঘিরে সামাজিক সমালোচনা রয়েছে। লালনের অনুসারীরা সাধারণত দরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং তাদের বেশিরভাগই নিরক্ষর। ভিন্নমার্গীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য শান্ত ও নিরাপদ স্থান প্রয়োজন। সেলক্ষ্যে ফকিররা সাধারণত সারাদেশে গ্রামের দুর্গম এলাকাগুলো বেছে নেয়। সাধুরা সমাজের বেশিরভাগ লোকের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তারা দুর্ব্যবহার, অবমাননা ছাড়াও প্রায়ই শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। ২০১৬ সালের ৩১ জুলাই স্থানীয় সংবাদপত্রের এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, চুয়াডাঙ্গার একটা প্রত্যন্ত গ্রামে অপরিচিত দুষ্কৃতকারীরা দুজন বাউলকে হত্যা করেছে এবং তাদের আখড়ায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এর দুই সপ্তাহেরও কম সময় আগে ঐ একই জেলায় চারজন বাউলকে আক্রমণ করা হয় এবং আহত করা হয়। দৃষ্কৃতকারীরা তাদেরকে বেঁধে রেখে তাদের চুল কেটে দেয় এবং তাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়[১] (১)। ফকিরদের প্রতি এই বিরূপ মনোভাব অনেক দিনের পুরানো। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ কেউ ফকিরদের অপছন্দ করেন (ঝা ২০০২)। চৌধুরী (২০০৯ খ: ৯৮৭-৯৯৫) উল্লেখ করেন, উনিশ ও বিশ শতকের বিখ্যাত লেখক মৌলভী আব্দুল ওয়ালী, মুন্সী এমদাদ আলী এবং মাওলানা আকরাম খাঁ লালন ও তার অনুসারীদের ইসলাম বিরোধী বলে দোষী সাব্যস্ত করেন। বাউল-ফকিরদের বিষয়ে সামাজিক এই নেতিবাচক মনোভাব অনেক দিনের; তবে কখনো কখনো সেই বিরূপ মনোভাব ফকিরদের উপর শারীরিক নির্যাতনে রূপ নেয়।

যদিও ফকিররা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, তবুও তাঁদের গান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয়। হাজার হাজার লোক কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ার লালন ধামে বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করেন। তাদের অনুষ্ঠানের খবর গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা হয়। একইভাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নব্য বাবু সমাজের বিকাশের ফলে শহরে বসবাসকারী উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের সদস্যদের মধ্যে বাউল সংগীতের প্রতি এক বিশেষ আগ্রহ লক্ষ করা যায় এবং তাদের অনেকেই বাউল সংগীতের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করেন (Lorea 2014:87)। বাউল সংগীতের প্রতি দর্শকদের ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণের ফলে সাধুদের সুবিধা ও অসুবিধা দুইই হয়েছে। একদিকে ফকিররা নিয়মিত খবরের কাগজ ও টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার পেয়েছে, অন্যদিকে সরকারি কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে ফকিরদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বাড়াচ্ছে। এখন সরকারি উদ্যোগে লালন ধামের পাশের খোলা মাঠে দেশের জনপ্রিয় শিল্পী-বুদ্ধিজীবী-সরকারি প্রতিনিধিদের নিয়ে ফকিরদের অনুষ্ঠানের সমান্তরালে আরেকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। ফকিরদের দুটো বাৎসরিক অনুষ্ঠানের দিনে, একই সময়ে সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় ঐ পপুলার আয়োজন করা হয়। ফলে ছেউড়িয়ার লালনধামে অনুষ্ঠান আয়োজনে ফকিরদের একক নিয়ন্ত্রণ আর নেই। কিভাবে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সমসাময়িক

[১] bauls assaulted in Chuadanga, শিরোনামে দি ডেইলি স্টার পত্রিকায় ২০১৮ সালে মার্চ মাদের ৭ তারিখে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয় চুয়াডাঙ্গায় দুইজন বাউলকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। রিপোর্টটি নেয়া হয়েছে এখান থেকেঃ http://www.thedailystar.net/backpage/2-bauls-assaulted-chuadanga-1262032

বাংলাদেশের ফকিরদের আত্মিক চর্চার ধারাকে কো-অপটেড বা সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণ করে তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

কোঅপটেশন বলতে একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে বিদ্যমান ব্যবস্থা পুরোপুরি বাতিল হয় না, কিন্তু সে ব্যবস্থার প্রাথমিক অর্থ বদলে গিয়ে বরং একটি ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয় (Stratigaki 2004:36)। এক্ষেত্রে ফকিরদের অনুশীলনের বৈধতা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তোলা হয় না ঠিকই, কিন্তু ঐ সব আচার অনুষ্ঠানে যে আন্তরিকতা ও মনোযোগ প্রয়োজন সেটাকে ছোট করে দেখা হয়। Coy and Hedeen (2005) কো-অপটেশন প্রক্রিয়ার দুটো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন Gamson (1969), Lacy (1982) ও Selznick (1949) পর্যালোচনা করে। এগুলো হলো ক্ষমতাসীন ও অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসীনদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও হুমকি। ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ এবং সাধকদের মধ্যে এক ধরনের নীরব দ্বন্দ্ব চলমান দীর্ঘদিন ধরে। এই দ্বন্দ্বের একটা স্পষ্ট ফল হচ্ছে কুষ্টিয়ার লালন ধামের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ফকিরদের একক আধিপত্য আর থাকছে না।

কো-অপটেশন সবসময় একপাক্ষিক হয় না। কখনও কখনও দ্বন্দ্বে জড়িত উভয় পক্ষের স্বার্থই কিছুটা ক্ষুণ্ন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বৈশ্বিক ও স্থানীয় কর্পোরেট গোষ্ঠীকে মোকাবিলা করতে তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক সংগঠকরা Democratic Underground, Free Republic, Indymedia, এবং Move On এর মতো ফোরাম গঠন করে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে (Pickard 2008)। বিপরীতভাবে একটি প্রধান ধারার মিডিয়া যেমন সিএনএন আই রিপোর্ট তৈরি করে নাগরিক সাংবাদিকতার এক গুরুত্বপূর্ণ টুলকে সুকৌশলে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে (Pickard 2008)। ফকিরদের নানাবিধ অনুষ্ঠান মিডিয়ায় প্রচার হওয়ায় তাদের পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা বেড়ছে, কিন্তু এই জনপ্রিয়তা এসেছে চড়ামূল্যের বিনিময়ে। সেটা হলো গুরুকেন্দ্রীক ফকিরিধারার জীবনচর্চার প্রতি লালন অনুরাগী সাধারণ মানুষের আগ্রহ অনেক কমেছে।

এ নিবন্ধের মূল বিষয়ে আলোচনার আগে একটি বিষয় পাঠকের কাছে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। ফকিরদের জীবন চর্চায় রাষ্ট্র কিংবা সিভিল সমাজের যে হস্তক্ষেপ তা মূলত তাদের বড় বড় অনুষ্ঠানকে ঘিরে। যেমন, ছেউড়িয়ার লালন ধামের বাৎসরিক আয়োজন। অন্যদিকে সাধুদের দৈনন্দিন যে কার্যকলাপ সে বিষয়ে রাষ্ট্রের বা সমাজের অন্যান্য প্রভাবশালী গোষ্ঠীর তেমন কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। এই অনাগ্রহের কারণ সম্ভবত ফকিরদের দৈনন্দিন ঐসব অনুষ্ঠানে গণমাধ্যমের অনুপস্থিতি। গণমাধ্যমের বা সাংবাদিকদের কম আগ্রহের সুবাদে ফকিররা সাধারণত তাদের প্রতিদিনের চর্চায় রাষ্ট্র বা সিভিল সমাজের অনাকাঙ্খিত কোনো হস্তক্ষেপের শিকার হন না। সাধুরা যে তাদের আখড়া হিসেবে জনবিচ্ছিন্ন একটি জায়গা বেছে নেন, তার কারণ, এই বিচ্ছিন্নতার কারণেই ফকিররা তাদের ভিন্ন আচার-আচরণ পালনের স্বাধীনতা পান। যদিও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও নতুন নতুন প্রযুক্তির কারণে (যেমন, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট) সাধুদের আকাঙ্খিত বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতা ধরে রাখা ক্রমশ অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ছে।

২। গবেষণা পদ্ধতি

এথনোগ্রাফিক গবেষণার অংশ হিসেবে লেখক ২০১৪ সালের জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে বিছিন্ন সময়ে কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর আখড়ায় অবস্থান করেন। কুষ্টিয়ার

ছেউরিয়াতে ২০১৪ সালের ১৬-২০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ১২৪ তম লালন তিরোধান দিবসে ফকিরদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিয়েছিলাম। ২০১৭ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে ফকিরদের আমি আরেক দফা সাক্ষাতকার গ্রহণ করি। কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়াতে লালন তিরোধান দিবসে ফকিরদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে আমি এই নিবন্ধ লেখা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি নিয়মিতভাবে প্রতিবছর কার্তিক মাসের প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৪ সালে অনুষ্ঠানটি ১৬ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে পাঁচদিন চলেছিল। উপরন্তু, ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত লালন তিরোধান দিবসের উপর আমি খবরের কাগজের বিভিন্ন প্রতিবেদনে বিশ্লেষণ করেছি (Content Analysis)।

উগ্র গোষ্ঠীর সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে ফকিরদের রক্ষা করার সরকারি নানাবিধ উদ্যোগকে লালনের অনুসারীরা কতটা মূল্যায়ন করেন তা আমি সাধুদের সাথে থাকা অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছি। লালনধামের বাৎসরিক উৎসব আয়োজনে সরকারের হস্তক্ষেপে গুরুরা কিছুটা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। একদিকে লালনের গানের প্রতি শিক্ষিত তরুণদের আগ্রহ বৃদ্ধিকে ফকিররা স্বাগত জানায়, অন্যদিকে ফকিরদের আখড়াকেন্দ্রিক গুরুবাদী আত্মিক চর্চার প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়ায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। লালন তিরোধান দিবসের বাৎসরিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জনগণের উপস্থিতিকে গুরুরা মোটাদাগে ইতিবাচক মনে করে। তবে লালনধামের ঐসব অনুষ্ঠানে ফকিররা আচার-অনুষ্ঠান পালনের সুবিধাজনক পরিবেশ না পাওয়ায় এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনুরাগের অভাব থাকায় গুরুরা বেশ অসন্তুষ্ট।

এই গবেষণার বেশ কয়েকটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই গবেষণার মধ্যে কেবল ফকির ও গুরুর মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের, যেমন লালন একাডেমীর প্রতিনিধিদের, স্থানীয় ও জাতীয় সরকারি কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলগুলোর প্রতিনিধিদের মতামত বিবেচনায় নেয়া হয়নি। এ বিষয়ে পরবর্তীতে মৌলিক গবেষণা হতে পারে।

এ প্রবন্ধের বাকি অংশ তিনটি পরিচ্ছদে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে আমি দেখাতে চেয়েছি স্থানীয় সরকারি, বেসরকারি নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে সাধুদের 'পবিত্র' লালনধাম রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ফকিরদের একক অধিকার কিভাবে খর্ব হয়েছে। ফকিরের নানবিধ আচার বা কর্মসূচিতে সাধারণ অনুরাগী বা কোনো গুরুর ভক্ত নয় এমন লোকেদের কিভাবে অংশগ্রহণ করতে দেয়া যায় সে বিষয়ে ফকিরদের মতামতের একক গুরুত্ব আর রইলো না। সাধুদের পবিত্র স্থান বলে বিবেচিত স্থানটিতে সাধনার জন্য একটা সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরি করার ক্ষেত্রে ফকিররা তাদের একক কর্তৃত্ব হারালো।এই পরিচ্ছেদে আমি দেখাবো ফকিরদের এই বাৎসরিক গুরুত্বপূর্ণ আচার কিভাবে একটি গতানুগতিক কালচারাল প্রোগ্রাম বা সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে রূপ নিয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, ফকিরদের, বিশেষ করে লালনের গানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়ে দীঘমেয়াদি গুরুবাদী ফকিরি ধারায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার প্রতি সাধারণ লোকের আগ্রহ কেন কমে যাচ্ছে সে বিষয়ে আলোচনা করবো। আমি বিশেষভাবে আলোচনা করবো কেন লালন গীতির জনপ্রিয় শিল্পীরা গুরুর নিকট নিজেদের সমর্পণে দ্বিধা করে। এমনও দেখা যায় গুরুর কাছে দীক্ষিত হলেও অনেকেই ফকির হওয়ার জন্য আন্তরিক অনুরাগ নিয়ে নিয়মিতভাবে আচার-অনুষ্ঠান পালনে ব্যর্থ হয়। একনিষ্ঠ সেবক হওয়ার ক্ষেত্রে তরুণদের অনাগ্রহের একটা পরিণতি হিসেবে দেখা যায় তাদের কেউ কেউ গুরুর দীক্ষা নিয়ে সাধু হতে না চেয়ে বরং সৌখিন বাউল হতে চায়। সব শেষে দেখানো হবে নিছক একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে ধরে রাখতে অদীক্ষিত তরুণদের মধ্যে কিভাবে

লালনের গানকে জনপ্রিয় করার জন্য চেষ্টা চলছে। ইউনেস্কোর সহায়তায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী এই ধরনের একটি উদ্যোগ হাতে নিয়েছে।

৩। নিজ দেশে পরবাসী ফকির

ফকিররা কিভাবে নিজ দেশে পরবাসী জীবনযাপন করে সে বিষয়ে দুটো দিক এই অংশে আলোচনা করবো। প্রথমে আমি আলোচনা করবো কিভাবে সাধকরা লালনধামের ব্যবস্থাপনায় নিজেদের একক কর্তৃত্ব হারালো। এরপর আমি দেখাবো কিভাবে স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষ লালন ধামের কাছাকাছি একটা খোলা মাঠে ফকিরদের সাধুসঙ্গের দিনে আলাদা মঞ্চে একই সময়ে জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে ভিন্নমতাবলম্বী সাধকদের কো-অপট করে।

কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ার লালনের আখড়া বহুদিন ধরে ফকিররা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। ১৮৯০ সালে লালনের তিরোধানের পরেই ফকিররা 'লালন মাজার ও সেবাসদন রক্ষা কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করে লালন ধামে দুটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য। ১৮৯৪ সালে একজন স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা ফকিরদের কর্মকাণ্ডকে ইসলাম সম্মত নয় বলে আখ্যায়িত করেন এবং সাধুদেরকে তাদের ধাম বা স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। ১৯৮৪ সালের ১৭ অক্টোবর তৎকালীন জেলা প্রশাসন লালন মাজারে একটা সভা করে এবং তখনকার জেলা প্রশাসক ফকিরদের জোর করে তওবা পাঠ করে ইসলামিক শরীয়ার পথে বাউলদের ফিরে আসার আহ্বান জানান। জেলা প্রশাসক লালনের গান গাওয়া বন্ধ করার জন্য বাউলদের নির্দেশ দেন (Aman 2011)।

কিন্তু ফকিররা তাঁদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক স্থান, সাঁইজির ধাম, ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানান (Masahiko 2013)। প্রশাসনের হুকুম অমান্য করার অপরাধে উপস্থিত পুলিশ বাহিনী ফকিরদের ভীষণভাবে প্রহার করে এবং কথিত পবিত্র জায়গা থেকে জোরপূর্বক তাদেরকে উচ্ছেদ করে। এতে অনেক ফকির আহত হন। বিরাটশাহ নামক একজন ফকির আহত অবস্থায় কয়েকদিন থাকার পর মারা যান। ফকির লালন শাহ সেবা সদন রক্ষা কমিটির ব্যানারে ফকির মন্টু শাহের নেতৃত্বাধীন সিনিয়র গুরুরা তখন লালন ধামে সরকারি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু করেন। তখন থেকেই ফকিরদের সাথে স্থানীয় সরকার ও রাষ্ট্রের বৈরী সম্পর্কের সূচনা হয়। ফকিরদের পক্ষ থেকে মন্টুশাহ সরকার ও সংশ্লিষ্টদের বিপক্ষে মামলা দায়ের করেন। যদিও আদালত ফকিরদের পক্ষে রায় দেয়, অদ্যাবধি এ রায়ের বাস্তবায়ন হয়নি। বরং ১৯৯৭ সালে তদানীন্তন সরকার লালন ধামের পাশে একটি পাঁচ তলা বিল্ডিং নির্মাণ করে সেখানে লাইব্রেরী, যাদুঘর, সংগীত নিকেতন ও অতিথিশালা নির্মাণের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন (Masahiko 2013:7)। সরকারের অপ্রত্যাশিত হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সেসময় সিভিল সমাজের সদস্যরা রাজধানী শহর ঢাকায় একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে। এই কমিটিতে ছিলেন কবি শামসুর রাহমান এবং সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীসহ কয়েকজন খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক। প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার শেষ পর্যন্ত ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। এতে ফকিররা মর্মাহত হয়। সেই থেকে ফকিররা তাঁদের নিজ দেশে পরবাসী।

২০১৪ সালের ১৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায়, আমি লালন তিরোধান উৎসবে যোগ দিতে ঢাকা থেকে কুষ্টিয়ার ছেউড়িতে যায়। এখানে মনে রাখা দরকার যে ফকিররা সাধারণত বলেন না যে লালন মারা

গেছেন। তারা তিরোধান শব্দটি ব্যবহার করেন। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি হলো শুরু বা শেষ নয় বরং একটা অধ্যায় থেকে আরেকটি অধ্যায়ে রূপান্তর। তারা পুনর্জন্মে বিশাস করে। যখন আমি ধামের দিকে যাচ্ছিলাম, ঢোকার পথে লক্ষ করলাম পুরো জায়গাটি সব বয়সের লোকজনে আকীর্ণ। যখন আমি প্রায় এক কিলোমিটার দূরে, তখনই আমি দেখতে পেলাম রাস্তার পাশ দিয়ে সারি সারি দোকান। সেখানে হরেক রকমের খাবার, একতারা, বই এবং খেলনা বিক্রি হচ্ছে। মূল জায়গায় প্রবেশ করতে প্রধান গেটের ডানদিকে এতোটাই ভিড় ছিল যে আমাকে বিল্ডিং কমপ্লেক্সের ভিতরে যেতে ঠেলাঠেলি করে জায়গা করে নিতে হলো। যেহেতু রাস্তার উভয় পাশ হকারদের দখলে তাই দর্শনার্থীরা একটিমাত্র লাইন তৈরি করে ভিতরে যাচ্ছিল আর বের হচ্ছিল। হাজার না হলেও, শত শত লোককে তাদের ঘাড় কাত করে চলাচল করতে হচ্ছিল। ভিতরে কোনো খালি জায়গা ছিল না। জনতাকে অনুসরণ করে, আমি শেষ পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলাম। আমি তখন আরও লক্ষ করলাম, দুই দিকে জনতার ভিড়। প্রবেশ পথের বাম দিকে আমি বিখ্যাত স্থানটি দেখলাম, যেখানে লালন শাহকে সমাহিত করা হয়েছে। তার ডানদিকে একটা সাদা ভবন আছে, যার একতলা আক্ষরিক অর্থে লোকজনে ভরপুর। তাদের মাঝে অল্প কয়েকজন সাদা পোশাক পরিহিত ফকির গোল হয়ে বসে আছেন। ফকিরদের চারদিকে ঘিরে আছে অসংখ্য দর্শণার্থী। অথচ লক্ষ করার বিষয় যে, সাদা পোশাক পরিহিত ফকির বা গুরুর সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েকজন।

পুরো ভবনটি ঝলমলে আলোয় সুসজ্জিত। সবচেয়ে বামের দিকের ভবনটির একটি ফ্লোরে লালন জাদুঘর, যেটি স্থানীয় সরকার তৈরি করেছে। মাঝের ভবনটিতে ফকিররা বসে আছে। সমাবেশে আমি কিছু ফকির দেখলাম, যাদের একজন ফকির দৌলতশাহ। তিনি জাদুঘর ভবনের ভেতরে জায়গা না পেয়ে বারান্দায় জায়গা করে বসলেন। ফকির শহর শাহ ভক্তদের মাধ্যমে লালন ধামের ডানদিকে প্রধান ভবনে তাঁর বসার জায়গা আগেই নিশ্চিত করেছিলেন। আমি কষ্ট করে যখন ঐ এলাকার মধ্যে প্রবেশ করি, তখন দেখি বড় ভবনের সামনে একটা ছোট জায়গা আছে। ঐ ছোট্ট জায়গাটিই লালনের মাজার। লালনের সমাধির ঠিক ডান পাশেই লালনের দীক্ষা গুরু মতিজান বিবির কবর। লোকজন সেখানে যান তাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য, পবিত্র আত্মাদের শান্তি কামনা করেন। অধিকাংশ দর্শণার্থী দীক্ষিত নয়। অনেকেই দূরবর্তী স্থান থেকে এসেছেন। সমাবেশের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো নানান ধরনের সাধকদের উপস্থিতি।তাদের কেউ কেউ গেরুয়া রংয়ের পোশাক পরেছেন যা লালন অনুসারীদের পোশাক নয়। কেউ কেউ সুফী ঐতিহ্যের অনুসারী এবং কেউ কেউ বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী। বিভিন্ন আত্মিক ঐতিহ্যের অন্যান্য অনেক অনুসারী উৎসবের স্থলে এসেছেন। কেউ কেউ প্রবেশ পথের দুই পাশে বসে আছেন রুদ্রাক্ষীর মালা পরে, যা স্থানটিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।

ভবনটিতে প্রবেশের পর আমি দেখলাম অসংখ্য দর্শণার্থী ফকিরদের ঘিরে আছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা একের পর এক লালনের গান পরিবেশন করছেন। তাঁদের অনেক ভক্ত এসে রীতি অনুসারে গুরুর পা চুম্বন করলো। তাদের কেউ কেউ লালনের গান ও অন্যান্য আত্মিক সাধন-অনুশীলন বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করলো। আরও দেখা গেলো যে, গুরুরা মাঝামাঝি জায়গায় কয়েকজন ভক্তকে নিয়ে বসে আছেন। দর্শণার্থীরা অবিরত ভবনে প্রবেশ করছে সাদা পোশাক পরিহিত ফকিরদের গান শুনতে। দর্শণার্থীরা একদল ফকিরের পাশে দাঁড়িয়ে অল্প কিছুক্ষণ সময় গান শুনছে। এরপর আরেকটি দলের গান শোনার জন্য অপেক্ষা করছে। বেশ জনাকীর্ণ স্থানে দর্শণার্থীদের অবিরাম

চলাচলের মধ্যে ফকিররা মাঝে মাঝে ধাক্কা খাচ্ছে। আমি শামস[২] ফকিরের সাথে আলোচনা করলাম। আলোচনার এক পর্যায়ে শামস ফকির তাঁর হতাশার কথা বললেন এবং পরামর্শ দিলেন যে কর্তৃপক্ষের উচিত দর্শণার্থীদের এমনভাবে বসতে বা থাকতে বলা যাতে সাধকরা সুষ্ঠুভাবে ভবনের মধ্যে তাদের আচার পালন করতে পারেন এবং গান গাইতে পারেন।

ভবনটির মধ্যে দর্শণার্থীরা আক্ষরিক অর্থে মেঝেতে বসে থাকা কয়েকজন ফকিরকে ঘিরে বসে আছে। ব্যাপক সংখ্যক লোকের উপস্থিতিতে ফকিররা একদিকে যেমন ভীষন খুশি তেমনি অন্যদিকে খুব উদ্বিগ্ন। ফকির লালনের প্রতি অসংখ্য মানুষের আগ্রহ দেখে একদিকে ফকিররা খুশী, অন্যদিকে সেবকদের মধ্যে আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য যে নিষ্ঠা ও ভক্তি দরকার তার অভাবে উদ্যোক্তারা উদ্বিগ্ন। ফকির ও দর্শণার্থীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকাটা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সাধনার জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলা ও আলাপ-আলোচনার জন্য শারীরিক নৈকট্যও প্রয়োজন। যাইহোক, উদ্যোক্তা ও দর্শণার্থীরা গুরুর সামনে মাথানীচু করে ভক্তি জানায় এবং গুরুরাও দর্শণার্থীদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। আমি লক্ষ করলাম যে, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের সম্পর্ক যার সাথে অন্যান্য সম্পর্কের অনেক বড় ব্যবধান।

শহর ফকির এবং তাঁর দল ভবনের মধ্যে এক কোণে বসে লালনের গান পরিবেশন করছিল।এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় ছিল। সমাবেশে গান পরিবেশন করা ফকিরদের জন্য গতানুগতিক বিষয় হলেও লাইভ টিভি ক্যামেরার উপস্থিতি অপেক্ষাকৃত নতুন বিষয়। শহর ফকির আমাকে জানালেন যে, তাঁর দলের পরিবেশনা জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেলে সরাসরি প্রচার করা হয়েছে। শহর ফকির নিজেই একজন কলেজের স্নাতক এবং একটি প্রাইভেট কোম্পানির সাবেক স্টাফ। তাঁর সাংবাদিক ও টিভি চ্যানেলের সাথে যোগাযোগ আছে। তিনি তাঁর পারফরমেন্স সরাসরি সম্প্রচার করেন। শহর ফকির একজন ব্যতিক্রমী সাধু, যিনি তাঁর কর্পোরেট চাকরি ছেড়ে দিয়ে সাধক হয়ে উঠেন। একজন প্রাক্তন কর্পোরেট চাকরিজীবী হিসেবে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সামাজিক মর্যাদা বিবেচনা করে শহর ফকির স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করেছেন। এই সরকারপক্ষই বাৎসরিক অনুষ্ঠান উদযাপনের সাংগঠনিক কমিটি এবং স্থানীয় ও জাতীয় সংবাদপত্র ও টিভি সাংবাদিকদের সদস্য। তিনি একবার তাঁর স্বপ্ন নিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি লালন ফকিরের কর্মকাণ্ডের প্রতি শিক্ষিত তরুণদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে বাউলদের মধ্যে নতুন ধারা তৈরি করতে চান। তাঁর মতে, অনেক সেবকই জানেনা তাদের সেবা কেন গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, তিনি খড়ম পরেন। শহর ফকির জোর দিয়ে বলেন যে, সব ফকিরদের উচিত খড়ম পরা, অন্যকোনো ধরনের জুতা পরিহার করা। একদিকে তাকে দেখে মনে হতে পারে তিনি গোড়া; অন্যদিকে শহর ফকির টিভি চ্যানেল কিংবা সংবাদপত্রের প্রচার পেতে বিশেষ আগ্রহী। শহর ফকির আরও বলেন 'হকেরঘর' নামে লালন ধামের উপর একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করতে তিনি সহযোগিতা করেছিলেন। সেই ডকুমেন্টারিতে দেখানো হয়েছে কিভাবে কর্তৃপক্ষ সাধকদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ফকিরদের একক কর্তৃত্ব খর্ব করেছেন।

---

[২]এই নিবন্ধে ফকিরদের প্রকৃত নাম না ব্যবহার না করে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে। ছদ্মনামগুলো কারো প্রকৃত নামের সাথে মিলে গেলে তা নিতান্তই কাকতাতালীয়।

ফকিরদের নিয়ে তৈরি করা সেবাসদন কমিটি অনেক দশক ধরে লালন ধামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে, কিন্তু স্থানীয় জেলা কর্মকর্তারা লালন একাডেমীর পক্ষে ধীরে ধীরে ঐ স্থানে বাৎসরিক অনুষ্ঠানের উপর প্রভাব খাটিয়ে আসছে। ফকির কমিটির সাবেক নেতা ছিলেন ফকির মন্টু শাহ। তিনি ২০১১ সালে মারা যান। ফকিরদের কার্যকর নেতৃত্বের অভাবে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কার্যত ধামের নিয়ন্ত্রণ করেন। যার একটি বিশেষ প্রমাণ স্থানীয় ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্বে একটা আলাদা কমিটি গঠন। ঐ কমিটি লালন ধামের পাশের খোলা মাঠে সাধুদের অনুষ্ঠানের সমান্তরালে আরেকটি সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন শুরু করেছে। লালনধামে ঢোকার পথে ডানদিকে একটা বিশাল বড় খোলা জায়গা আছে যেখানে রাষ্ট্রঘোষিত অনুরূপ সাংস্কৃতিক কর্মসূচি সাধারণত অনুষ্ঠিত হয়। আমি যখন স্টেজের সামনে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ প্রথমবার দেখলাম, আমি ভাবলাম, এটা একটা আলাদা কর্মসূচি হতে পারে। এটা ছিল লালন তিরোধানের উপর রাষ্ট্রপক্ষ আয়োজিত কর্মসুচি। লালন একাডেমী কার্যকরী পরিষদ কমিটি ঐ কর্মসূচির আয়োজন করে। এ কমিটি সর্বদাই স্থানীয় জেলা কমিশনারের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের বক্তৃতা, মাঝে মাঝে মন্ত্রীদের, গবেষকদের এবং বুদ্ধিজীবিদের বক্তৃতা এবং সেই সাথে জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনা। যে বিষয়টি অনুষ্ঠানকে ব্যাপক জনপ্রিয় করে তোলে তা হলো বিখ্যাত শিল্পীদের সরাসরি পরিবেশনা।

এই বিশাল মঞ্চ ও তার সামনের বিশাল জনসমাগম আমজনতার মধ্যে এই অনুষ্ঠানের ব্যাপক জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত দিলেও মঞ্চের অনুষ্ঠান অনেকটা গতানুগতিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মতোই মনে হয়। ভবনের অভ্যন্তরে বসে থাকা গুটি কয়েক শিল্পীকে জনপ্রিয় প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ বলে মনে হলো। অন্যদিকে বিশাল মঞ্চ, জনপ্রিয় শিল্পীদের উপস্থিতি এবং সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতি দেখে ফকিরদের জনপ্রিয়তা বোঝা যায়। ফকিররা, বিশেষ করে লালন, বর্তমান বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে অনেক জনপ্রিয়, কিন্তু এই জনপ্রিয়তা এসেছে চড়া মূল্যের বিনিময়ে। লালনের গানের প্রশংসাকারী লোকের সংখ্যা সমসাময়িক বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেলেও গুরুর দীক্ষা নিতে চাওয়ার এবং ফকিরি চর্চায় সারা জীবন কাঠানোর আগ্রহ দিন দিন কমছে। শহর ফকির মন্তব্য করেন, এই সময়ে (২০১৭ সালের অক্টোবরে) জনতার ঢল নেমেছিল লালন ধামের বাৎসরিক উৎসবে। এতো লোকের ঢল নেমেছিল যে, লালন ধামে থাকতে পলিথিন বিছাতে হয়েছিল। কর্মসূচিতে অংশহণকারী লোকের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর মতে, গত-ছয় সাত বছরে এত লোকের সমাগম ধামে আর হয়নি।

উপরন্তু অতীতে এমনকিছু কদাচিৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে ঘটছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত তরুণসহ দেশের প্রথম সারির সাংবাদিক, প্রতিভাবান চলচ্চিত্র নির্মাতাদের পাশাপাশি কিছু প্রাইভেট কোম্পানির প্রাক্তন কর্মীকেও ভক্ত হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। শহর ফকির এই সময়ে প্রকৃত সাধুর অভাব সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সাধুরাও শিক্ষানবিশদের মধ্যে আন্তরিকতা ও মনোযোগের অভাব সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সাধুদের গান পরিবেশনার বাণিজ্যিকীকরণের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। রইস ফকির আক্ষেপ করে বলেন তাঁর ভক্তদের মধ্যে কেউই খেলাফত পাওয়ার যোগ্য নয়। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের জুন মাসে অবশ্য তিনি বলেন এরই মধ্যে তার কয়েকজন ভক্ত খেলাফত পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠেছেন।

এ নিবন্ধের পরবর্তী অংশে আমি আলোকপাত করবো সমসাময়িক বাংলাদেশে ফকিরদের প্রাক্সিসের দুটি মূল পরিবর্তনের উপর। প্রথমত, লালনের গানের জনপ্রিয় শিল্পীরা কেন গুরুর দীক্ষা নিয়ে আখড়া ভিত্তিক ফকিরি জীবনযাপন করতে দ্বিধাবোধ করে। দ্বিতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন উদ্যোগ কিভাবে সাধক হবার চাইতে লালনের গানের শিল্পী সত্তা বিকাশের প্রতি অধিক মনযোগী।

৪। জনপ্রিয়তার সাথে সাথে বাড়ে আশঙ্কা

ফকিরদের জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় কারণ লালনের গান। কিন্তু এই জনপ্রিয়তা মাঝে মাঝে ফকিরদের জন্য বড় দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদিও ফকিরদের প্রতি সাধারণ উৎসাহীদের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলছে বলেই গুরুরা মনে করছেন, কিন্তু শঙ্কার বিষয় হলো, তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই গুরুর দীক্ষা নিয়ে ফকিরি জীবনযাপন করতে আগ্রহী। এমনকি কেউ কেউ দীক্ষিত ভক্ত হয়ে উঠলেও, রইস ফকির ও শহর ফকির ক্ষোভের সাথে বলেন,অধিকাংশই খিলাফত অর্জনের অনুশীলন চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়। ফকিররা সুনির্দিষ্ট করে বলেন, আজকাল টিভি প্রোগ্রাম,সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে লালনের গানের উপর আলোচনা হলেও ফকিরদের গুরুবাদী-আখড়াকেন্দ্রিক আত্মিক অনুশীলনের উপর মোটাদাগে আগ্রহ অনেক কমছে। লালনের গানের জনপ্রিয়তার সাথে গুরুর শিষ্য হয়ে ফকিরি জীবন বেছে নেওয়ার পথে নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়ার আগ্রহ ও নিষ্ঠার অভাব জনপ্রিয় মিডিয়ার কন্টেন্ট সিলেকশনের নীতির সাথে সম্পর্কিত।

২০১৭ সালের ১৬ অক্টোবর দেশের অন্যতম জনপ্রিয় বাংলা সংবাদপত্র দৈনিক ইত্তেফাক ছেউড়িয়াতে লালনের তিরোধানের ১২৭তম বার্ষিকীর উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে একটি ছবিকে হাইলাইট করা হয় যেখানে দেখা যাচ্ছে জনপ্রিয় লোকসংগীত শিল্পী মমতাজ লালনের তিরোধানে গান পরিবেশন করছেন। ছবিতে মমতাজের পাশে মালা পরিহিত একজন লোক দাঁড়িয়ে বাদ্য বাজাচ্ছেন। সেখানে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়: প্রথমত, বাংলাদেশে লালনের অনুসারীরা সাধারণত সাদা পোশাক পরে। কিন্তু ছবিতে ফকিরদের সাদা কোনো পোশাকে দেখা যাচ্ছে না। পেছনে সাদা পোশাক পরিহিত যারা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদেরকে ফকির বলে মনে হচ্ছে না, যেহেতু তাদের কারো দাঁড়ি বা লম্বা চুল নেই। দ্বিতীয়ত, ফকিররা সাধারণত লালনের কোনো প্রতিকৃতি বা ছবি ব্যবহার করেন না। তৃতীয়ত, প্রতিবেদনে একটা বিষয় উঠে আসেনি তা হলো প্রোগ্রামটি আয়োজন করেছে ভারত বাংলাদেশ লালন পরিষদ, যার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী। উপরোন্তু, এটি লালন পরিষদ আয়োজিত প্রথম অনুষ্ঠান। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়নি যে, প্রোগ্রামটি ফকিরদের বাৎসরিক কর্মকাণ্ডের একটা অংশ নয়। পরিষদ আয়োজিত ঐ অনুষ্ঠান ফকিরদের সাথে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়নি। পরিষদ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছে দিনের বেলায়, অন্যদিকে লালনের তিরোধান উপলক্ষে অনুষ্ঠানটি শুরু হয় সন্ধ্যা থেকে।

ঐ প্রোগ্রামে আগত একজনের মতে, স্থানীয় পুলিশ ফকিরদের আচার অনুষ্ঠান ও সমাবেশের সাথে একই সময়ে অন্যদেরকে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা থেকে বিরত রেখেছেন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কেবলমাত্র লালন একাডেমীকে মাইক্রোফোন ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। লালন ধামে একই ধরনের কর্মসূচি পালনে পুলিশ ভবনগর ও নবপ্রাণ নামক অন্য দুটি দলকে অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি দেয়নি। পুলিশের দাবি নিরাপত্তার জন্য তারা এটি করেছেন। তারা মাইক্রোফোন ব্যবহারে

সরাসরি নিষেধাজ্ঞা জারি করে এই ভেবে যে ছোট ছোট সমাবেশ থেকে শব্দ এসে লালন একাডেমী আয়োজিত সরকার সমর্থিত অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্য শুনতে অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। বড় মঞ্চে অনুষ্ঠিত একাডেমীর কর্মসূচির সাথে একই সময়ে যদি ছোট ছোট সংগঠনগুলো মাইক্রোফোন ব্যবহার করে, তাহলে সরকার আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রতি দর্শকদের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটতে পারে। একই রকম যুক্তিতে অন্যরাও বলতে পারে যে, লালন একাডেমী আয়োজিত মঞ্চের সাংস্কৃতিক কর্মসূচির কারণে ফকিরদের আচার অনুষ্ঠানেও দর্শনার্থীদের পুরোপুরি মনোযোগ আকর্ষণে অসুবিধা হতে পারে।

যদিও ইত্তেফাক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, পরিষদ লালন ধামের দুটো বাৎসরিক অনুষ্ঠানের একটি পালন করেছেন, তবুও তারা লালন ধামের গুরুদের সমাবেশের প্রধান জামায়াতকে কম গুরুত্ব দিয়ে প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে। একইদিনের আরেকটি প্রতিবেদনে সংবাদপত্রটি দুটো ছবি ছাপে আলাদাভাবে; একটি লালন ধামের এবং আরেকটি আলাপরত ফকিরদলের ছবি। এই প্রতিবেদনটি ফকিরদের ছবি বাদ দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করা হয় স্থানীয় সময় ১:৩৬ মিনিটে। স্পষ্টতই একদল ফকিরের ছবির সংবাদের মূল্য একটি সুসজ্জিত লালন ধামের ছবির চেয়ে অনেক কম। এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে গুটি কয়েক সাদা পোশাক পরিহিত ফকির দর্শণার্থীদের ছবির চেয়ে লালন ধামের ছবির দৃশ্য সংবাদ হিসেবে বেশি মূল্যবান।

ফকিররা আরও উদ্বিগ্ন এই কারণে যে,লালন গীতির জনপ্রিয় শিল্পীদের অনেকেই দীক্ষিত নয়। অ-দীক্ষিত শিল্পীদের গানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা নাও থাকতে পারে, কারণ তারা গুরুর অধীনে থেকে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে পারেনি। অ-দীক্ষিত শিল্পীরা মাঝে মাঝে গানগুলো এমনভাবে পরিবেশন করেন যা দেখে গুরুদের আশংকা হয়, যারা গুরুর দীক্ষায় দীক্ষিত নয় তারা গানগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করতে পারেন। অধিকন্তু, জনপ্রিয় শিল্পীরা প্রায়ই ফকিরদের বিধিনিষেধ অমান্য করে। যেমন, সাধারণত যারা কোনো গুরুর দীক্ষা নেয়নি কিন্তু গান গাইতে চান তাদেরকে শুধুমাত্র দৈন্য গানগুলো গাওয়ার জন্য গুরুরা উৎসাহিত করেন। দৈন্য গান ছাড়া বাকী সাব গান যেহেতু সাধনা সম্পর্কিত তাই শুধুমাত্র গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েই সেসব গানের মর্ম জানতে হয়।

বাংলাদেশের লালন সংগীতের জনৈক বিখ্যাত শিল্পী ব্যতিক্রম। তিনি ধ্রুপদী ঢংয়ে লালনের গান পরিবেশন করে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর পরিবেশিত লালনের গান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, বিশেষত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে। যদিও তিনি দুইজন ফকির, মোকসেদ শাহ ও করিম শাহের কাছ থেকে গান শিখেছিলেন, কিন্তু তিনি কখনোই কোনো গুরুর ভক্ত হননি। তিনি বলেন,লালনের গানে মুগ্ধ অধিকাংশ লোক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে লালন সম্পর্কে জানেন এবং ভক্ত হন। পরিবেশনার ক্ষেত্রে তিনি গুরুর কাছে গিয়েছেন শুধুমাত্র গান শেখার জন্য (Zakaria and Zaman 2004)। তিনি আরও বলেন, একজন বাউলের কণ্ঠে লালনের গান পরিবেশনা এবং শিল্পীর গলায় বাউল গান পরিবেশনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাঁর মতে, তাঁর গায়কীর ভিত্তিটা তৈরি হয়েছে ধ্রুপদী সংগীত থেকে। কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বলেন, যেকোনো শিল্পীরই নিজস্ব ভঙ্গি থাকে গান গাইবার (Zakaria and Zaman2004)।

বাংলাদেশের সেই খ্যাতনামাশিল্পী যেখানে লালনের গান পরিবেশনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার উপর জোর দিয়েছেন, গুরুরা তখন আশংকা করছেন আজকাল অনেকেই লালনের গান করেন কিন্তু গুরুর কাছে দীক্ষা নেন না। তিনি পরিষ্কারভাবে লালনের গান পরিবেশন করার বিষয়টি আলাদা করেছেন

সাধক হওয়া থেকে। গুরুরা সাধারণত মনে করেন, একজন শিল্পীকে গুরুর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া উচিত এবং গানের মূল অর্থ উপলব্ধির জন্য ফকিরি আচার পালন করা উচিত। শিল্পী ও সাধকদের মধ্যে এই পার্থক্যকরণ মানুষকে সাধক না হয়ে গায়ক হবার প্রতি বেশি আগ্রহী করে তুলতে পারে।

তিনটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়। বাউল গান নামে যে গানগুলো পরিচিত সেগুলোর সবগুলো লালনের গান নয়। দ্বিতীয়ত, অদীক্ষিতদের প্রতি গুরুদের নির্দেশনা স্পষ্ট, সাধনার বিষয়বস্তু নিয়ে গান পরিবেশনার জন্য একটা গাইডলাইন থাকতে হবে। তৃতীয়ত, লালনের গান গাইতে পারলেই একজন ফকির হয় না। বরং যদি কেউ লালনের গান গাইতে নাও পারেন, তিনিও ফকির হতে পারেন এবং আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারেন। সেই সাথে শিল্পী ও সাধকদের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে গুরুর উৎকণ্ঠা হলো শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে এমন কিছু প্রবণতা লক্ষ করা যায় যেখানে অনেকে যারা লালনের গান পরিবেশন করে, ফকিরদের মতো পোশাক পরে,আচার-অনুষ্ঠান সমাবেশগুলোতে অংশগ্রহণ করে কিন্তু গুরুর কাছে দীক্ষা নেয় না বা নিজেদেরকে সমর্পণ করে না। শহর ফকির বলেন:

> *বড় বিপদ হলো যার গুরুপাঠ নাই তারা দাঁড়ি রাখে, গোফ রাখে,সাদা পোশাক পরে, লালনের গান গায় কিংবা গায় না, নিজের মতো চলাচল করে,তারা সৌখিন বাউল, খুব বেশি সৌখিন বাউল। যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমাদের গুরু পাঠ কোথায়, তখন তারা বলে, আমি এখনও গুরু খুঁজছি! কিন্তু যদি গুরু নাই পেয়ে থাকো, তাহলে কিভাবে তুমি এতো পাল্টে গেছো? তরুন প্রজন্মের মধ্যে একটা ক্রেজ, তারা লালনের গান গাইতে চায়, একটা গীটার দিয়ে হলেও। বড় চুল রাখবে সাধুদের মত; বছরে দুইবার লালন সাঁইজির ধামে ছেউড়িয়ার প্রোগ্রামে আসবে।*

বাউল গানের ব্যাপক প্রচার ও ফকিরদের প্রতি সমসাময়িক বাংলাদেশী তরুণদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। কেউ কেউ সংগীতে এতোটাই মুগ্ধ হয়ে গেছে যে, তারা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছে এবং বাউল গান গাইতে শুরু করেছে। তাদের কেউ কেউ অনেক সময় শিল্পী হিসেবে খ্যাতি পাচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় ঐসব তরুণরা সাদা পোশাক পরা শুরু করেছে এবং ফকিরদের মতো দাঁড়ি রাখছে। যদিও বাউল গান পরিবেশনকারী হিসেবে তাদের আগ্রহ অনেক কিন্তু ঐ তরুণ ভক্তরা নিজেদেরকে গুরুর কাছে সমর্পণ করার পাশাপাশি দীক্ষিত হতে অনাগ্রহী। ফকিরদের অনুষ্ঠানে এ ধরনের অনেক অদীক্ষিত শিক্ষানবীশ নিয়মিত অংশ নেয়। বাংলাদেশে লালন গীতির অ-দীক্ষিত পরিবেশকদের অতি সাম্প্রতিক রূপটি হলো এই ধরনের সৌখিন বাউল।

৫। জীবন্ত সংস্কৃতি যখন মনে হয় ঐতিহ্য

২০০৮ সালে ইউনেস্কো বাউল সংগীতকে ইনটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটির র্রিপ্রেজেন্টটিভ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। ২০০৮-২০১০ সাল থেকে ইউনেস্কো 'Action Plan for the Safeguarding of Baul Songs' নামের একটা প্রকল্পের অর্থায়ন করে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। সে প্রকল্পের অংশ হিসেবে নির্বাচিত ফকির গুরুদের সাথে আলোচনা হয়। সিভিল সোসাইটির সদস্য, বিশেষ করে অধ্যাপক, গবেষক এবং পেশাজীবি শিল্পীরা

এই প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করে। প্রকল্পের শিরোনাম থেকে বোঝা যায় বাউল গান বিপদাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, একে রক্ষা করা প্রয়োজন। উদ্বিগ্নতার বিষয়টি প্রকল্পের সারকথা থেকে বোঝা যায়: এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল গুরু ও তরুণ শিক্ষার্থীদের একত্রিত করে কর্মশালার মাধ্যমে বাউল গানের যথাযথ প্রচার নিশ্চিত করা। ইউনেস্কো ফকিরদের গানকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নিকট এসব গান পৌঁছে দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইউনেস্কো যথাযথ প্রচার বলতে কি বুঝিয়েছে, তবে সে বিষয়টি ঠিক পরিষ্কার নয়। মনে রাখা দরকার, গানের কথা ও গাওয়ার ধরন বিষয়ে গুরুরা অনেক সময় নিজেদের মধ্যে দ্বিমত পোষণ করেন। ঐ গবেষণায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে গানের কথার সত্যতার উপর এবং গায়কী ঢংয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে (Lohani 2010)।

ইউনেস্কোর কর্মকর্তারা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বাউল গান ছড়িয়ে দেবার অভিপ্রায়ে বাউল সংগীতের উপর কুষ্টিয়ায় চারদিনের কর্মশালার আয়োজন করে (Haq 2010: 13)। প্রকল্প কর্মকর্তারা মনে করেন, গান পরিবেশনার সঠিক উপায় হলো কর্মশালার আয়োজন করা। অধিকন্তু প্রকল্প পরিচালক তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বাউল সংগীতকে জনপ্রিয় করে তোলার উপর জোর দেন। এখানে দুটো বিষয় লক্ষণীয়: প্রথমত, লালনের গান পরিবেশনার শিক্ষা সাধক হওয়া থেকে পুরোপুরি আলাদা। দ্বিতীয়ত, এটা প্রস্তাব করা বোকামী হবে যে, বাউল গান রক্ষা করার জন্য গুরু ও ভক্তদের মধ্যে আখড়া ভিত্তিক এ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অপরিহার্য নয়। গুরু ও ভক্তদের লালনের গান যথাযথ প্রচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মশালায় যোগদানের যে প্রস্তাব তা দীর্ঘদিনের আখড়াভিত্তিক গুরুর শিক্ষার পদ্ধতির বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে। গুরুরা তাদের আখড়ায় ভক্ত ও দর্শণার্থীদের সাথে আলাপ আলোচনা করাটা পছন্দ করেন। প্রচলিত আছে যে, 'রাজা সাধুর বাড়ীতে যায়, সাধু যায় না'। রইস ফকির ব্যাখ্যা করলেন, তিনি সাধারণত কোনো অদীক্ষিত ভক্তের বাড়িতে যান না এবং খাবারও খান না, কেননা তিনি দীক্ষিত ভক্তের সেবাই পছন্দ করেন। যখন আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি উত্তর দিলেন এই বলে যে, এটা খাবারের গুণগত মানের জন্য নয় বরং অনুরাগ ও হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা যা ফকিররা চায় তা অভক্তের কাছে পাওয়া যায় না। যদিও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঐতিহ্যবাহী গুরুশিষ্য সম্পর্কের প্রতিস্থাপন নয়, তবুও কর্মশালার প্রস্তাব করাটা সাধুদের চর্চার বিরোধী।

ফকিরদেরকে আখড়ার বাইরে এনে আধুনিক অডিটোরিয়ামে তাদের গুরুকে তথাকথিত ট্রেইনার বা প্রশিক্ষক বানানো হয়। কর্মশালায় লালনের গান শেখানোর জন্য তরুণদের আমন্ত্রণ জানানোটা গুরুর আখড়াকেন্দ্রিক ফকিরি চর্চার গুরুত্বকে খাটো করে। লালনের গানের অদীক্ষিত শিল্পীরা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, লালনের গানগুলে সাধুদের ফকিরি চর্চার গাইডলাইন। ইউনেস্কোর বর্ণিত বাউল গান রক্ষা করার প্রকল্পটি আখড়াকেন্দ্রিক গুরুবাদী ফকিরি ধারাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে।

একই ধরনের অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের বাউলদের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। Benjamin Krakauer (2015:356) বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রভাবশালী বাঙ্গালিরা প্রকৃত বাউল বাছাই করার নামে বাউলদের আরও বেশি ঝুঁকির মুখে ফেলে দিয়েছে। নকল বাউল থেকে আসল বাউল বাছাই করার নামে সাধকদেরই বরং আরও বেশি ঝুকিতে ফেলে দেয়া হয়েছে। এ কারণে বাউলদের অনেকে সম্মান হারিয়েছেন এবং তাদের আয় কমে গেছে। লেখক ওই লেখায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিল্পী পার্বতী বাউলের বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। দীক্ষিত হিসেবে তিনি শুধু গেরুয়া রঙের

পোশাক, রুদ্রাক্ষের মালা পরেন। শুধুমাত্র একতারা বাজিয়ে পার্বতী বাউল গান গাইতে পছন্দ করেন। একজন শিক্ষিত ও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষিত শিল্পী হিসেবে গান পরিবেশন করেন; তদুপরি তিনি মার্জিত বাংলায় কথা বলেন। কীর্তন পরিবেশন করে তিনি অনেক বেশি দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এটি কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎসবে সংগীত পরিবেশন করেন। Krakauer আরও বলেন, লোকসংগীতের এরূপ বিকৃতির কারণে গতানুগতিক বাউল শিল্পীরা, যারা শিক্ষিত সুসজ্জিত নয়, তারা পেশাগত কিংবা আমজনতার সম্মান ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা হারাচ্ছেন। ধ্রুপদী আদলে ফরিদা পারভীনের লালনের গান পরিবেশনা তাকে বাংলাদেশে লালন সংগীতের আইকন করে তুলেছে। পার্বতী বাউলের ফকিরি জীবনযাপন করেন; অন্যদিকে ফরিদা পারভীন ফকিরি সাধনার চর্চার মধ্যে নেই। শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে লালনের গান জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ফরিদা পারভীন ও পার্বতী বাউল উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। যদিও লালনের গানের এই জনপ্রিয়তা প্রকৃত সাধকদেরকে ক্ষতির মুখে ফেলতে পারে। নিঃসন্দেহে এই দুইজন শিল্পী বাংলাদেশের ও পশ্চিমবঙ্গের তরুণ, শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে লালনের গান ও সাধুদের জনপ্রিয় করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

৬। কো-অপটেশন

ফকিরদের চর্চায় রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় নানাবিধ হস্তক্ষেপ ফুকোর 'পাওয়ারের' একটা ভালো উদাহরণ মনে হতে পারে; প্রকৃতপক্ষে এটি তা নয়। বরং সামজিক আন্দোলন গবেষণার একটা গুরুত্বপূর্ন কনসেপ্ট 'কো-অপটেশন' ফকিরদের এই অবস্থাব্যাখ্যা করবার জন্য উপযুক্ত হতে পারে। ফুকোর পাওয়ার জোরপূর্বক দমন, নিপীড়ন কিংবা সামাজিক চুক্তির অংশ হিসেবে কাজ করে না বরং একটা কৌশল হিসেবে কাজ করতে পারে (Foucault 1995)। একইভাবে ফকিরদের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য সরাসরি শক্তি প্রয়োগ করার পরিবর্তে বাংলাদেশের সরকারি কর্তৃপক্ষ দীর্ঘমেয়াদি কৌশল অবলম্বন করেছে। বিশেষ করে ছেউড়িয়ার লালনের ধামের রক্ষণাবেক্ষণের ও ধামের সকল অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সহযোগিতা দেয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও তার নানাবিধ সহযোগী সংগঠন ফকিরদের ভিন্নমার্গী জীবন চর্চা কো-অপট করে।

অন্যতম খ্যাতিমান গুরু শহর ফকির সাধারণত ফকিরদের পক্ষে বার্ষিক নানবিধ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন এবং সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন আজকাল ফকিররা একত্রে মিলে লালন ধামের বাৎসরিক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে অক্ষম,কেননা বিভিন্ন লোক ভীড় করে। আইন শৃংখলারক্ষাকারী বাহিনীকে ঐ স্থানের নিরাপত্তা বিধান করতে হয়। খ্যাতিমান ঐ গুরু মন্তব্য করেন:

> *লালন সাঁইজী হলো ফকিরদের সম্পত্তি; ফকিররা তার দেখভাল করবে। কিন্তু লালন একাডেমীর সদস্যদের হস্তক্ষেপের কারণে বিষয়গুলোতে একটু জটলা তৈরি হয়। বিশেষ কিছু আইন আছে সাধুসঙ্গ করার, কিন্তু সেইগুলো ঠিকঠাক পালন করা হয় না। তবে যা হয় তা খুব বেশি খারাপ না; জেলা প্রশাসন সেখানে আছে। তারা সাধুদের সম্মান দেয়, সেবার ব্যবস্থা করে। তারা সাধুদের সামনে রেখে কাজ করে।*

যখন আমি জানতে চাইলাম কখন থেকে সাধুদের কাজে বা ধামের অনুষ্ঠানে সরকারি কর্তপক্ষের হস্তক্ষেপ শুরু হয়েছে, এর উত্তরে তিনি বলেন, এই পরিস্থিতি শুরু হয়েছে ২০০৩ সাল থেকে। তখন একটা বড় অংকের টাকা বরাদ্দ হয় সরকারের পক্ষ থেকে। প্রথমে একটা মঞ্চ হলো, তারপরে অডিটোরিয়াম ও গেস্টরুম তৈরি হলো। লালনের ধামের সামনের গাছগুলো সরকারি সহযোগতিায় কেটে ফেলা হলো। তিনি আরও বলেন, লালন একাডেমীর লোকজন এসবে যুক্ত আছে।এভাবে তারা তাদের কর্তৃত্ব ধরে রাখলো। সরকারি অর্থায়নে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল সম্পর্কে অবগত রয়েছেন জাহের ফকির। সরকারি অর্থায়নে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলাফলকে পাওয়ারের ফুকোডিয়ান ব্যখ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হলেও বাস্তবে তা নয়। ১৯৯০ সালে সরকারি কর্মকর্তাদের অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ফকিরদের যৌথ প্রতিবাদের স্মৃতি এখনও ভুলে যাননি সাধুরা। সাধুদের সে আন্দোলনের নেতা ফকির মন্টু শাহের অনুসারীরা ফকিরদের সেই কমিটি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন।

লালন ধামের পাশে সুসজ্জিত মঞ্চে লালন একাডেমী আয়োজিত সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে সরকারি কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী ও জনপ্রিয় শিল্পীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সাধু-গুরুদের আচার অনুষ্ঠান থেকে দর্শকদের আগ্রহ লালনের গানের জনপ্রিয় পরিবেশনার দিকে নিয়ে যায়। যেখানে গুরুরা লালন ধামের বাৎসরিক সমাবেশকে সেবক, ভক্ত অনুরাগী এবং শুভাকাঙ্খিদের মধ্যে আত্মিক বন্ধন তৈরির গুরুত্বপূর্ণ আচার বলে মনে করেন, সেখানে জনপ্রিয় মঞ্চে অদীক্ষিতদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ফকিরদের ভিন্নধারার চিন্তা-আদর্শের চর্চার সুযোগ সংঙ্কুচিত করে। এর ফলাফলই হলো কো-অপটেশন (Corntassel 2007:164)।

কো-অপটেশনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন ফকিরদের অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল করে (Baur and Schmitz 2012:13)। ফকিররা সাধারণত অনুষ্ঠান করার জন্য ভক্ত ও শুভাকাংখীদের দানের উপর নির্ভর করেন। কিন্তু লালন একাডেমী ধীরে ধীরে ফকিরদের সরকারি কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভরশীল করে তুলছে। হাজার হাজার অংশগ্রহণকারীদের সেবা করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করাটা ফকিরদের একার পক্ষে বড় বোঝা হয়ে যেত। লালন একাডেমী সাধুসঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং তাদের নিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। শহর ফকির স্বীকার করেন যে, সাধুসঙ্গে আয়োজনের নিয়মগুলো সঠিকভাবে সবসময় পালন করা হয় না। লালন কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে ফকিররা প্রায় সর্বদাই প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা বেষ্টিত থাকে। সাংবাদিক ও উৎস্যুক জনতা ফকিরদের কর্মকাণ্ড ফোনে কিংবা ক্যামেরায় ধারন করতে ভীড় জমায়।

শহর ফকিরের মন্তব্য এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ: লালন একাডেমী সাধুদেরকে 'সামনে রেখে কাজ করে'। সরকারি কর্মকর্তা ও তাদের লালন একাডেমীর প্রতিনিধিরা এবং গণমাধ্যম ফকিরদের সহযোগিতা করে বলে দাবি করে। কিন্তু চলমান এই কো-অপটেশনের দৃশ্যমান ফলাফল হলো এই যে, ফকিরদের আচার অনুষ্ঠান দিনে দিনে সাধারণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রূপ নিচ্ছে। এই রূপান্তর কো-অপটেশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটা বিশেষ দিক হচ্ছে এ যে, এটি ছোট ছোট যত ভিন্নধর্মী ধারা সমাজে তৈরি হয় সেগুলোকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে নেয় বা আত্মীকরণ করে সামাজিক মূলধারায় নিয়ে আসার চেষ্টা করে (Thompson and Coskuner-Balli 2007:136)। একদিকে তরুণ সৌখিন বাউলদের জনপ্রিয়তা, অন্যদিকে গুরুবাদী ধারায় সাধক হয়ে

ওঠার সাধনায় নিজেকে সমর্পণ না করে নিছক শিল্পী হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সাম্প্রতিক প্রবণতা ফকিরদের ভিন্নমার্গীয় সাধনার ধারা থেকে বিচ্যুত হবার সুস্পষ্ট লক্ষণ।

৭। উপসংহার

সমসাময়িক বাংলাদেশে লালন গীতির পেশাদার শিল্পীদের চেয়ে সাধক ফকিরদের পরিচিতি যেমন কম, তেমনি সাধক হিসেবে তাঁদের কদর কম। যদিও গুরুর তত্ত্বাবধানে দীর্ঘমেয়াদি সাইকোসোমাটিক প্রশিক্ষণের ধারণাটি ফকিরদের জীবনচর্চার উপলব্ধিতে জরুরি, সাম্প্রতিক সময়ে গুরুর কাছে সমর্পণ করে ফকিরি জীবনচর্চায় নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করার প্রতি মানুষের আগ্রহ আশঙ্কাজনকভাবে কম বলে সাধুদের বিশ্বাস। বিশেষ করে, সাধনার অংশ হিসেবে লালনের গান পরিবেশনার যে গুরুত্ব সেটি বৃহত্তর জনমানুষের কাছে অস্পষ্ট বলেই তাঁদের অনেকের ধারণা। কেন লালনের গানগুলোর জনপ্রিয় শিল্পীরা দীক্ষিত ফকিরদের চেয়ে, অনেক বেশি গুরুত্ব পায় তা ব্যাখ্যা করার জন্য এই প্রবন্ধে ভিন্নমতাবলম্বী ফকিরদের কোঅপটিংয়ের নানাবিধ প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান করা হয়েছে। আমি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় চিহ্নিত করেছি। প্রথমত, লালন ধামের উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে কাজ করা হলো রাষ্ট্রের কৌশল। এই প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের নানাবিধ সংগঠন ভিন্নমতাবলম্বী ফকিরদের বাৎসরিক উৎসব আয়োজনে বেশ কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দ্বিতীয়ত, লালনের গানের জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনা গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার হলেও আখড়া বা ধামকেন্দ্রিক সাধনা ও তাতে গুরুদের গুরুত্ব খাটো করা হয়। তৃতীয়ত, সিভিল সমাজের কিছু কিছু প্রচেষ্টায় বিদেশী এজেন্সিগুলো (যেমন ইউনেস্কো) লালনের গানকে সাধনার ধারা থেকে বিচ্যুত করে নিছক একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পরিণত করছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ফকিররা তিনটি প্রধান বাধা মোকাবেলা করছে। প্রথমত, মন্টু শাহের মতো শ্রদ্ধেয় ও প্রভাবশালী গুরুর অভাব যিনি লালন ধামের ব্যবস্থাপনায় অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যৌথভাবে প্রতিবাদ করতে গিয়ে ফকিরদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দুই, ভবিষ্যতে যারা খেলাফত পেয়ে গুরু হতে পারেন এরূপ ফকিরদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তৃতীয়ত, তরুণদের মধ্যে সৌখিন বাউল হবার একটা ধারার বিকাশ ঘটছে। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতাটি ফকিরদের আত্মিক শক্তির অবক্ষয়কে প্রতিফলিত করেছে এবং তৃতীয়টি ভিন্নমতাবলম্বী ফকিরদের কো-অপটিংয়ের চলমান প্রক্রিয়ার সর্বসাম্প্রতিক অধ্যায়।

যদিও প্রকাশিত সংবাদপত্র ও টিভি প্রতিবেদন গণমাধ্যমের নীতিমালাসমূহ প্রতিফলিত করে, তবুও কিভাবে মিডিয়ার প্রতিনিধিরা কো-অপটেশন প্রশ্নের উত্তর দেয় ভবিষৎ গবেষণার জন্য তা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। লালন ধামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি লোকদের হস্তক্ষেপ জরুরি, কিন্তু কিভাবে ভিন্নমতাবলম্বী ফকির ও সরকারি নানবিধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ককে পুনরায় বিবেচনা করা যেতে পারে সে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা দরকার। ফকিরদের মতো প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলো যাতে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা পায় এবং তাদের ভিন্নমতালম্বী জীবনাচারণ স্বাধীনভাবে চর্চা করে টিকিয়ে রাখতে পারে সে বিষয়টির উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া দরকার।

দেশ-বিদেশের নানাবিধ ভিন্নমার্গীয় জীবনচর্চার একটা বিশেষ সম্ভাবনা হলো চলমান বৈশ্বিক বাজার ব্যবস্থার বিকল্প তৈরির একটা মডেল হয়ে উঠা (Ferrari 2012:35)। ফেরারীর আশাবাদ সতর্ক ও ক্রিটিক্যাল মনোযোগ দাবি করে। ফকিরদের জীবন-চর্চা আত্মকেন্দ্রিক ও অহংবাদী

জীবনধারার নিউলিবারেলিজম এর বিকল্প ব্যবস্থা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু এখনো সেটি সম্ভাবনা আকারে আছে; একে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য দরকার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক আন্দোলন।

গ্রন্থপঞ্জি

চক্রবর্তী, সুধীর (১৯৮৯): গভীর নির্জন পথে, কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স।

_____(১৯৯২): ব্রাত্য লোকায়ত লালন, কলিকাতা, ভারতঃ পুস্তক বিপনী।

চৌধুরী, ২০০৯(ক): ভূমিকা, লালন সমগ্র, সম্পাদনা আবুল আহসান চৌধুরী, ঢাকাঃ পাঠক সমাবেশ।

_____২০০৯(খ): লালন সমগ্র, সম্পাদনা আবুল আহসান চৌধুরী, ঢাকাঃ পাঠক সমাবেশ।

ঝা, শক্তিনাথ (২০০৮): লালনের মানুষ-তত্ত্ব, লালন সমগ্র, সম্পাদক আবুল আহসান চৌধুরী, ঢাকা, পাঠক সমাবেশ।

_____ (২০১০): বস্তুবাদী বাউল, উদ্ভব, সমাজ, সংস্কৃতি ও দর্শন, কলিকাতা, ভারত, দে'জ পাবলিশং।

দাস, মতিলাল (১৯৫৮): লালন-গীতিকা, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা।

হিতকরি, (১৮৯০): 'মহাত্মা লালন ফকির', লালন সমগ্র, সম্পাদনা আবুল আহসান চৌধুরী, ঢাকা, পাঠক সমাবেশ।

রফিউদ্দিন, খন্দকার (২০০৯): 'ভাবসংগীত' ঢাকা, সদর প্রকাশনী।

শরীফ, আহমদ (২০০৯): "লালন শাহ", লালন সমগ্র, ঢাকা, পাঠক সমাবেশ।

Aman, Shanaz (2011): "Mantu Shah; Key Preserver of Lalon Songs, Passes Away," *The Kushtia Times,* September 26. Accessed November 22, 2017. http://www.thekushtiatimes.com/26/09/2011/mantu-shah-key-preserver-of-lalon-songs-passes-away/.

Baur, Dorothea, and Hans Peter Schmitz (2012): "Corporations and NGOs: When accountability leads to co-optation." *Journal of Business Ethics* 106 (1):9-21.

Corntassel, Jeff (2007): "Partnership in Action? Indigenous Political Mobilization and Co-optation during the First UN Indigenous Decade (1995-2004)," *Human Rights Quarterly*:137-166.

Coy, Patrick G, and Timothy Hedeen (2005): "A Stage Model of Social Movement Co- optation: Community Mediation in the United States," *The Sociological Quarterly,* 46 (3):405-435.

Das, Rahul Peter (1992): "Problematic Aspects of the Sexual Rituals of the Bauls of Bengal," *Journal of the American Oriental Society,* 112 (3):388-432.

Ferrari, Fabrizio M. (2012): "Mystic Rites For Permanent Class Conflict: The Bauls Of Bengal, Revolutionary Ideology And Post-Capitalism," *South Asia Research,* 32 (1):21-38.

Foucault, Michel (1995): *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Translated by Alan Sheridan. New York: Vintage.

Gamson, William A. (1969): *Power and Discontent*. USA: Dorsey Press.

Haq, Md. Nazrul. (2010): "Message from the Project Director and Publisher," *In Baulsangeet (A Collection of Baul Songs): Action Plan for the Safeguarding of Baul Songs*, edited by Kamal Lohani, 13-14. Dhaka: Bangladesh Shilpakala Academy.

Jha, Saktinath (1995): "Cari-candra Bhed: Use of the Four Moons." In *Mind, Body and Society: Life and Mentality in Colonial Bengal*, 65-108. Calcutta: Oxford University Press.

Knight, Lisa I. (2011): Contradictory Lives: Baul Women in India and Bangladesh, New York: Oxford University Press.

Kperogi, Farooq A. (2011): "Cooperation with the corporation? CNN and the Hegemonic Cooptation of Citizen Journalism through iReport. Com," *New Media & Society* 13 (2):314-329.

Krakauer, Benjamin (2015): "The Ennobling of a "Folk Tradition" and the Disempowerment of the Performers: Celebrations and Appropriations of Bāul-Fakir Identity in West Bengal," *Ethnomusicology,* 59 (3):355-379.

Lacy, Michael G. (1982): "A Model of Cooptation Applied to the Political Relations of the United-States and American-Indians," *Social Science Journal,* 19 (3):23-36.

Lohani, Kamal ed. (2010): *Baulsangeet (A Collection of Baul Songs): Action Plan for the Safeguarding of Baul Songs*. Dhaka: Bangladesh Shilpakala Academy.

Lorea, Carola Erika (2014): "Searching for the Divine, Handling Mobile Phones: Contemporary Lyrics of Baul Songs and their Osmotic Response to Globalisation," *History and Sociology of South Asia*, 8 (1):59-88.

Masahiko, Togawa (2013): "Sharing the Narratives: An Anthropologist among the Local People at the Mausoleum of Fakir Lalon Shah in Bangladesh," *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*: 21-36.

McDaniel, June (1992): "The Embodiment of God among the Bāuls of Bengal," *Journal of Feminist Studies in Religion*: 27-39.

Openshaw, Jeanne (2002): *Seeking Bauls of Bengal. Cambridge*. Cambridge University Press.

Pickard, Victor W. (2008): "Cooptation and Cooperation: Institutional Exemplars of Democratic Internet Technology," *New Media & Society* 10 (4):625-645.

Selznick, P. (1949): *TVA and the Grassroots: A Study of Politics and Organization*. Berkeley: University of California Press.

Stratigaki, Maria (2004): "The Cooptation of Gender Concepts in EU Policies: The Case of Reconciliation of Work and Family," *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society,* 11 (1):30-56.

Thompson, Craig J. and Gokcen Coskuner-Balli (2007): "Countervailing Market Responses to Corporate Co-optation and the Ideological Recruitment of Consumption Communities," *Journal of Consumer Research,* 34 (2):135-152.

Zakaria, Saymon, and Mustafa Zaman (2004): "Melodies for Eternity: Farida Parveen's Life in Focus," *Star Weekend Magazine.*